দেশে ফেরা

শুজা রশীদ

অবশেষে ১৯৭৩ সালের আগষ্ট মাসে ভারত ও পাকিস্তান বন্দী বিনিময় চুক্তি করলো। ভারত পাকিস্তানের প্রিজনার অব ওয়ারদের মুক্তি দেবে। পরিবর্তে পাকিস্তান সেখানে আটকে পড়া বাংলাদেশীদেরসহ অন্যান্যদের দেশে ফেরত পাঠাবে। পেশাগত দুঃশ্চিন্তা থাকলেও বাবা-মা দু'জনাই খুবই খুশী হলেন। বন্ধুদেরকে হারানোর দুঃখে আমি অবশ্য যথেষ্ট ম্রিয়মান হয়ে গেলাম। আমানের অনুভুতিও তেমন ভিন্ন হলো না। আমরা দু'জন একদিন রাস্তা ধরে অনেক দূর হেঁটে গেলাম চুপ চাপ। শেষে ফেরার পথে আমান হঠাৎ বললো - দেশে ফিরে তোরা কোথায় থাকবি?

বাবা মাকে আলাপ করতে শুনেছি ব্যাপারটা নিয়ে। বাবাকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে প্রথমে জয়েন করতে হবে। অবস্থা যদি ভালো না হয় তাহলে তার ইচ্ছা রিটায়ার করে ঢাকাতেই প্রাইভেট প্রাকটিস শুরু করা। ব্যাপারটা আমানকে ব্যাখ্যা করলাম। দেখা গেলো আমানের বাবাও একই ধরনের চিন্তাভাবনাই করছেন। কিন্তু তারপরও আমরা দু'জনাই বুঝলাম ঢাকাতে থাকলেও হয়তো খুব কাছাকাছি থাকা হবে না। ঘর থেকে বাইরে পা ফেললেই মুখোমুখি হওয়া যাবে না। হয়তো কালে ভদ্রে দেখা হবে, হয়তো দেখা হবেই না। কত মানুষ ঢাকাতে। শহরটাও বড়।

নভেম্বর মাসের শেষ দিকে বাক্স পেটরা গুছিয়ে আরো অনেকের সাথে আমরাও ট্রেনে চাপলাম। ট্রেনে করাচি যাবে, সেখান থেকে প্লেনে করে ঢাকা। রাতুলরা একই ট্রেনেই যাচ্ছে। আমানরা কয়েকদিন পরে যাবে। সে আমাকে বিদায় দিতে ট্রেন ষ্টেশনে এলো তার বাবার সাথে। ট্রেন ছাড়বার ঠিক আগে লজ্জার মাথা খেয়ে বললো - তোর কপাল ফাটানোর কথা মনে রাখিস না।
আমি ওর সাথে কোলাকুলি করে হাসি মুখে বললাম - বাবা বলেছে এই কপালের দাগ নাকি ঝট করে যাবে না। তোর কথা আমার অনেক দিন মনে থাকবে।
আমান বিশেষ একটা হাসে না কিন্তু এই মুহুর্তে তার মুখে খুব উজ্জল এক টুকরো হাসি ফুটে উঠলো। আমি হাত নেড়ে ট্রেনে উঠলাম। ট্রেন ছাড়ি ছাড়ি করছে। আমার পিছু পিছু বাবাও উঠে পড়লেন। দেখতে দেখতে ছেড়ে দিলো ট্রেন। প্রায় দুই বছরের নিবাস পেছনে ফেলে কোয়েটার অভিমুখে এগিয়ে চললাম আমরা। কোয়েটা থেকে করাচি, করাচি থেকে ঢাকা। ঢাকায় পৌঁছে কি হবে কে জানে। বাবা-মায়ের তাগাদা স্পষ্ট বুঝতে পারি। আমার দুঃশ্চিন্তা অন্যখানে। এতোগুলো ভালো বন্ধুকে হারালাম এখানে, আবার নতুন করে বন্ধু হবে তো সেখানে? কোথায় থাকবো, কিভাবে থাকবো, কে জানে? সেখানে আরো ছেলেরা থাকবে তো?

বন্ধুর মজা একবার পেয়ে গেলে একাকি থাকা খুবই কষ্টকর। মিল্কী অবশ্য এখন দুই বছরের। সে দৌড়াদৌড়ি করে, অনেক কথা বলে। খুব আদুরে গলায় ভাইয়া ভাইয়া বলে ডাকে। প্রায় সারাক্ষণ ছায়ার মতো সেটে থাকে আমার সাথে। ব্যাপারটা আমার ভয়ানক ভালো লাগে। ছোট ভাই থাকার আনন্দটা পুরোপুরি উপভোগ করি।

অপূর্ব সুন্দর প্রকৃতি আর রোমাঞ্চকর পাহাড়ী পথ ধরে চলে আমাদের ট্রেন ... চল ... চল .... চলরে ... চল.... চলরে .... চলরে .... চল নজরুলের ভক্ত হয়ে উঠেছি ইতিমধ্যে। বিশেষ করে তার ছন্দময় কবিতাগুলো যেন ইতিমধ্যেই কণ্ঠস্থ হয়ে গেছে। আমি ট্রেনের শব্দের সাথে ছন্দ মিলিয়ে মার্চ করি আর উচ্চকণ্ঠে আবৃতি করতে থাকি -

চলরে চল চল
উর্ধ গগনে বাজে মাদল .....

আমার সঙ্গী হয় মিল্কী। পুরো ব্যাপারটা সে এমন উপভোগ করছে যে তার মুখের হাসি আর ফুরায় না। রুশী তার পুতুল কোলে করে মায়ের কাছ ঘেঁষে বসে থেকে মুচকি মুচকি হাসে। মিল্কীর সাথে তারও অনেক খাতির হয়েছে। তার প্রিয় পুতুলগুলো পর্যন্ত সে মিল্কীকে খেলতে দেয়। অন্য কেউ হাত দিলে কেয়ামত হয়ে যায়।
ঝিকির-ঝিক ঝিকির-ঝিক ..... ক্রমাগত এক সঙ্গীতের মতো মাঠ-ঘাট-প্রান্তর পেরিয়ে কখনো পর্বত, কখনো উত্তল, কখনো সমতল, কখনো অন্ধকার গুহা পেছনে ফেলে এগিয়ে চলতে থাকি আমরা। এতো লম্বা পথে বাবা-মা খানিকটা অসহিষ্ণু হয়ে পড়তে থাকেন। বিশেষ করে করাচি থেকে কোয়েটা আসার সময় আমাদেরকে প্রথম শ্রেণীর টিকিট দেয়া হয়েছিলো। যতখানি আরামে খেয়ে দেয়ে গিয়েছিলাম, ফেরার পথে ঐ ধরনের কোন ব্যবস্থা নেই। খাওয়া-দাওয়া মা সাথে করে যা এনেছিলেন তা দিয়েই চলতে হচ্ছে। বাবার হাতে পয়সা-কড়ি সামান্য আছে। দেশে গিয়েও লাগবে। অকারণে খরচ করতে চাইলেন না। কোয়েটা পার হতে ধীরে ধীরে পার্বত্য এলাকার রেশ কাটতে লাগলো। সিন্ধু প্রদেশের স্বাভাবিক সমতল ভুমি ধীরে ধীরে এক ভিন্ন প্রাকৃতিক রূপ আমাদের সামনে উম্মোচন করে ধরলো। ক্রমাগত পেছন দিকে ছুটে যাওয়া গাছ-পালা আর দূরের কোন গৃহের ছবি মনের মধ্যে আটকে যায়। আমি আর মিল্কী ট্রেনের কম্পার্টমেন্টের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করি। মায়ের কাছে অবশ্য ধমক খেতে হয়। কিন্তু আমরা একরকম অগ্রাহ্য করি। সমগ্র পরিবেশটার মধ্যেই যেন এক ধরনের মুক্তির স্বাদ রয়েছে। যেন আমাদের বাহন আমাদেরকে নিয়ে চলেছে পার্থিব সব বন্ধনের বাইরে, এক নতুন কোন জগতে।

কোন ষ্টেশনে ট্রেন দীর্ঘক্ষণের জন্য থামলেই আমরা ষ্টেশনে নেমে পড়ি। মা সাথে চাল-ডাল নিয়ে এসেছিলেন। ছোট একটা ষ্টোভ জ্বালিয়ে ট্রেনের পাশেই তিনি রান্না করতে বসে যান।

পিকনিক পিকনিক ভাব। আমাদের ফূর্তি আর দেখে কে? এমনকি রুশী পর্যন্ত আনন্দে আত্মহারা হয়ে মাকে জিজ্ঞেস করতে লাগলো - এটা পিকনিক হচ্ছে মা, এটা পিকনিক হচ্ছে?
মা তাকে একট ধমক দিলেন। - হ্যা, পিকনিক হচ্ছে না আর কিছু।

মায়ের মেজাজ খারাপ হবার কারণটা আমরা কেউ ধরতে পারলাম না। বাবা অবশ্য পরিবেশ হাল্কা করবার জন্য আমাদের সাথে দৌড়াদৌড়ি করে খেলা করতে লাগলেন। বাশার ও রাতুলরাও একই ট্রেনে যাচ্ছে কিন্তু তারা দূরের একটা কম্পার্টমেন্টে। আমরা ষ্টেশনে তাদের সাথে দেখা করলাম। বাবার সাথে অবশ্য জাফর আঙ্কেলের বিশেষ আলাপ হলো না। তাদের সম্পর্কের শীতলতা আমাদের ছোটদেরকে বিশেষ স্পর্শ করলো না। আমরা আরো কয়েকটা ছেলেমেয়ের সাথে কিছুক্ষণ ছোঁয়াছোঁয়ি খেললাম। মিল্কীর আগ্রহ ও আনন্দ দেখে খুব ভালো লাগলো। একটু পর পর ধপাস ধপাস করে পড়লেও তার আনন্দ ও উদ্দীপনার কোন কমতি নেই। ভাবতেও অবাক লাগে এই সেদিনই যখন আমরা একই পথে চলেছিলাম এই একটুখানি ছিলো মিল্কী। আর এখন সে দিব্যি মাতালের মতো দৌড়াদৌড়ি করছে। বাংলাদেশে ফিরলে সবাই ওকে দেখে নিশ্চয় খুব অবাক হবে।

অবশেষে আবার ট্রেন ছাড়ে। আমরা গরম গরম খিচুড়ি সাবাড় করি। আমাদের ফুর্তি দেখে মায়ের মেজাজেরও কিছু উন্নতি হয়। মা শেষতক আর না পেরে ফিক্ করে হেসে ফেললেন - তোদের দেখে মনে হচ্ছে যেন ঈদ লেগেছে। এতো খুশীর কি হলো?
আমরা সেই কথা শুনে খিল খিল করে হাসি। মা কি করে বুঝবে ট্রেনে চেপে দুরন্ত বেগে ছুটে যাওয়ার মধ্যে কি অভাবিত আনন্দ আছে? সম্ভবত বয়সের সাথে সাথে সেই যাত্রার রোমাঞ্চ হারিয়ে যেতে থাকে। বিশেষ করে যাদের মেজাজের গরম যতো তাদের আনন্দ ততো কম। মায়ের মেজাজ নিয়ে আমাদের তিন ভাই বোনের কারোরই কোন দ্বিমত নেই। ধীরে ধীরে ঘুমের পরশ বুলিয়ে আমাদেরকে ঘিরে ধরে রাতের আগ্রাসী অবয়ব। চারদিকের পরিচিত দৃশ্যগুলো মুছে যেতে থাকে একটু একটু করে। সারাদিনের উত্তেজনা আর ছুটাছুটির ক্লান্তি অবশ করে দিতে থাকে আমাদের শরীর ও মনকে। কখন ঘুমিয়ে পড়ি খেয়ালও থাকে না। বিশ্বস্ত একটা জীবন্ত ঘোটকের মতো আমাদের সবাইকে বুকে ধরে সব বাধা পেছনে ফেলে ছুটে চলতে থাকে ট্রেনটা। ঘুম যা - ঘুম যা ... ঘুম যা ....। অভাবিতভাবেই ঘুমের মধ্যে প্রিয় সব মানুষকে স্বপ্নে দেখি ....ঝিমা, দাদা, দাদী, খালা, খালু, চাচি, চাচু, রানী আপা আর কত কত মানুষ ..... স্বপ্নের মধ্যেও তাদের সবাইকে দেখার চেতনায় আকুল হয়ে উঠি। আমরা আসছি রানী আপা। আর বেশীদূর নেই।

বাংলাদেশ

করাচি পৌঁছে আমরা একটা রাত আর্মির মালির ক্যান্টনমেন্টে থাকলাম। জামান দুলাভাই ও আয়েশা আপাদের বাসায় থাকা হ'লোনা। তারা সিভিলিয়ন বিধায় তাদের ফ্লাইটের তারিখ পড়বে আরো পরে। তারাও বাংলাদেশে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। বাবা একা অনুমতি নিয়ে এক সময় তাদের সংগে দেখা করে আসলেন। পরদিনই আমাদের ফ্লাইট। এবার অবশ্য আমরা সরাসরি ভারতের উপর দিয়ে উড়ে যাবার অনুমতি পেলাম বলে খুব বেশী সময় লাগলো না। গতবার যখন পেনে উঠেছিলাম মিক্কী অনেক ছোট ছিলো, খুব চেঁচামেচি করেছিলো। এবার তার আনন্দ দেখে কে? সে সম্ভবত পেনটাকে একটা পেগ্রাউন্ড বলে ভ্রম করলো কারণ তার লাফ-ঝাপ আর দৌড়াদৌড়িতে আমরাসহ আশেপাশের মানুষেরাও চোখ উল্টাতে লাগলো। রুশী দু'বার বমি করলো। বাবা আগে থেকেই তৈরী হয়ে থাকায় কোনবারই কোন দূর্ঘটনা ঘটলো না। তবে অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম আমার নিজের ভয়ানক উচ্চতা ভীতি তৈরি হয়েছে। এর আগের বার ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি। এখন যেহেতু বয়েসটা খানিকটা বেড়েছে, এই নতুন আলামত উপদ্রবের মতো চেপে বসেছে। আমি অনেকক্ষণ ভয়ে বাইরে পর্যন্ত তাকাতে পারলাম না।

ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে পেন যখন ল্যান্ড করলো তখন চোখটা মাত্র বুঁজে আসছিলো। চোখ খুলে পেনের জানালা দিয়ে বাইরে গাছপালা, দালান-কোঠার অবয়বগুলো হঠাৎ কেন যেন অনেক মধুর মনে হয়। যদিও ঢাকাতে কখনো বসবাস করিনি তবুও এক ধরনের অদ্ভুত একাত্মতা অনুভব করলাম্, মনটা অকারণেই ভালো লাগায় ভরে উঠলো। মায়ের চোখে পানি দেখলাম। কেন ঠিক বোঝা গেলো না। বাবা মুচকি হেসে বললেন - যাক, শেষ পর্যন্ত ফেরা গেলো!

মিক্কী এয়ারপোর্টে দাড়িয়ে থাকা আরো কিছু পেন দেখে উত্তেজিত হয়ে এমন চিৎকার জুড়ে দিলো যে আমাদের সবার কান ঝালাপালা। রুশী তৃতীয়বারের মতো বমি করবার উদ্যোগ নিচ্ছিলো মনে হয়। আমরা পৌঁছে গেছি শুনে সে হাঁপ ছাড়লো।

আমাদের ঢাকাতে খুব বেশি নিকটাত্মীয় কেউ নেই। খুলনার আসফাক ডাক্তারের বেশ কয়েকজন ভাই ঢাকাতে থাকেন। তাদের একজন মোস্তাক চাচা। তিনি বেশ নাম করা ইঞ্জিনিয়ার। বাবা-মায়ের সাথে তাদের খুবই ঘনিষ্ট সম্পর্ক। তারাই আমাদেরকে নিতে এলেন এয়ারপোর্টে। যদিও আমাদের সবারই ইচ্ছা ছিলো দেশের আত্মীয়-স্বজনদের সাথে দেখা করতে যাওয়া কিন্তু বাবাকে আগে কাজে হাজিরা দিতে হবে। সেখানে একটু সুস্থিরতা এলে তারপরে হয়তো ছুটি নেয়া যাবে। আমি ইতিমধ্যেই দিন গুনতে শুরু করেছি।

মোস্তাক চাচাদের ভুতের গলির বাসায় আমরা বেশ কয়েকদিন থাকলাম। তাদের তিন ছেলে মেয়ে। ইন্তি আপা, আকাশ ভাই ও স্বকাশ। ইন্তি আপা আমাদের চেয়ে কয়েক বছরের বড় হলেও খুবই স্নেহময়। খুব দ্রুত তার ভক্ত হয়ে গেলাম আমরা সবাই। ছয়জন ছেলেমেয়ে একই বাসায় - ভয়ানক ফূর্তিতে কাটতে লাগলো আমাদের সময়।

বাবা কাজে যোগ দিয়েই ছুটির দরখাস্ত করলেন। মাসখানেকের ছুটি মঞ্জুর হলো। পরদিনই বাক্সপেটরা বেঁধে আমরা খুলনার বাসে উঠলাম। আমাদের উদ্দেশ্য খুলনায় খালাদের সাথে দেখা করে সাতক্ষীরা যাওয়া। সেখানে দু'-একদিন থেকে দেশের বাড়িতে চলে যাবো। খুলনা পৌঁছাতে প্রায় বারো ঘন্টা লেগে গেলো। খুলনা শহরের নারকেল গাছ ঘেরা মনমাতানো অবয়বটা নজরে পড়তেই আমরা সকলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। ট্রেনে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকা সম্ভব, কিন্তু বাসের সংকীর্ণ জায়গায় রীতিমতো অত্যাচারের মতো মনে হয়। বিশেষ করে রুশীর বমির গন্ধে বসা দায়। আমাদের যে রকম লম্বা পরিকল্পনা তাতে বেচারির কপালে প্রচুর দুঃখ আছে। একমাত্র যার মধ্যে ক্লান্তি বা বিরক্তির কোন ছাপ নেই সে হচ্ছে মিল্কী। একটু পর পরই সে এক একটা প্রশ্ন করে কান ঝালাপালা করছে। বাসষ্ট্যান্ড থেকে আমরা দু'খানা রিক্সা নিলাম। দেখা গেলো অধিকাংশ রিক্সাওয়ালাই মোসাব্বের উকিলকে চেনে। সম্ভবত ছোট শহর হওয়ায় বড় বড় উকিল, ডাক্তারদের সবাইকেই তারা চেনে।

খালাদের বাসায় পৌঁছে বিশাল একটা হৈ চৈ হলো। খালাদের আগেই খবর দেয়া হয়েছিলো। আমরা পৌঁছে দেখলাম সারা পাড়া যেন উপচে পড়ছে আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানাতে। মা খালাকে জড়িয়ে ধরে স্বভাব মতো বেশ কান্নাকাটি করলেন। রুশী এতো মানুষজন দেখে ঘাবড়ে গিয়ে মায়ের আঁচল ধরে নাকি কান্না শুরু করলো। মিল্কীকে রিক্সা থেকে নেমে এক পলকের জন্য দেখেছিলাম। তারপরই উপস্থিত জনতা যেন তাকে লুফে নিলো। সে যেহেতু এই বাসাতেই জন্মগ্রহণ করেছিলো সেহেতু সকলেরই দেখলাম তার প্রতি ভিন্ন ধরনের অনুভূতি। খালার বাসার তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। যদিও খালু স্বাধীনতার সমর্থক ছিলেন না কিন্তু তিনি স্পষ্টভাবে কোন বিরোধিতাও করেননি। বরং শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান হয়ে তিনি স্থানীয় অনেক হিন্দুদের জীবন রক্ষা করেছিলেন। যে কারণে যুদ্ধ পরবর্তিকালে তার তেমন কোন সমস্যা হয়নি। তাছাড়া রনি ভাই বহাল তবিয়তে যুদ্ধ থেকে ফিরে আসায় এই বাড়ির মর্যাদাও অনেকখানি বেড়ে যায়। যদিও আরো দু-দশজন মুক্তিযোদ্ধার মতো রনি ভাই নাকি সরকারের কাছ থেকে তেমন কোন সুবিধাই অর্জন করতে পারেননি - খালার মুখে শুনলাম। রনি ভাইকে দেখে অবশ্য একই রকমই লাগলো। তাদের চিলে কোঠার তাস পেটানোর আড্ডা আগের মতই জমজমাট। মনি ভাইও আগের মতই হাসিখুশী আছে। হঠাৎ হঠাৎ একটা কথা বলে আর সবাই

পেট চেপে ধরে হাসতে থাকে। নীচ থেকে চা-নাস্তা পাঠাতে পাঠাতে পার্বতীর মায়ের অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। সে সর্বক্ষণ বিড় বিড় করে বকাবকি করে দুই ভাইকে। ইউনুস নাকি যুদ্ধে গিয়েছিলো। রনি ভাইয়ের সাথে তার দেখা হয়েছিলো একবার ট্রেনিংয়ের সময়। সে যুদ্ধের পর আর ফিরে আসেনি। খালু তার গ্রামের বাড়িতে বাবা-মায়ের কাছে খবর নিয়েছিলেন। সে সেখানেও ফিরে যায়নি। যুদ্ধে সে মারা গেছে কিনা জানার কোন উপায় নেই।

আমরা এক দিন থাকলাম খুলনায়। বাবা-মা দু'জনাই দাদা-দাদী ও নানাকে দেখার জন্য মনে মনে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। তারা দেশের বাড়িতে না যাওয়া পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। সত্যি কথা বলতে কি আমার নিজেরও মূল আগ্রহ ছিলো গ্রামের মেঠো পথ। খাল-বিল পুকুরের সঙ্গী হয়ে সেই চেনা পথ-ঘাট আর নারকেল পাতায় চাল – মোড়ানো মেটো ঘর-বাড়িগুলোর যে এমন অসম্ভব টান সেটা এমন স্পষ্ট করে আগে কখনো বুঝিনি। দাদুর বাড়ি, নানুর বাড়ি, রানী আপা সবার জন্য মনটা যেন হঠাৎ করে ভয়ানক চঞ্চল হয়ে উঠলো। সারাক্ষণ দিন গুনতে লাগলাম কখন শহরের গন্ডি পেরিয়ে গ্রামাঞ্চলে যাবো। আলেক মিয়ার সুরেলা বাঁশীর শব্দ যেন এখনো আমার কানে লেগে আছে। কেমন আছে আলেক মিয়া? সে কি এবারও ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলবে - কেমন আছিসরে খোকা? এতো দেরি করলি কেন?

খুলনা থেকে সাতক্ষীরার দূরত্ব খুব বেশী না হলেও বেশ ঘুরে যেতে হয় বলে বাসে প্রায় ছয় ঘন্টার মতো লেগে যায়। আমরা সবাই খুব বিরক্ত হলাম। একটু পর পরই বাস থামে। মানুষজন উঠা নামা করে। লোকাল বাসের মতো আচরণ। বাবা দু'একবার আপত্তি জানালেন কিন্তু কোন লাভ হলো না। আমরা যখন সাতক্ষীরা পৌঁছালাম তখন বিকেল। চাচু আগেই জানতেন আমরা আসবো। তার বাসা থেকে বাসষ্ট্যান্ড মাইলখানেকের পথ। তিনি মীনু আপাকে নিয়ে বাসষ্ট্যান্ডে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। বাবাকে দেখে ঝট করে বোঝা যায় না চাচুর জন্য তার তেমন অনুভূতি আছে। কিন্তু বাস থেকে নেমেই তিনি চাচুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন। –কেমন আছেন ভাইজান? চাচুর কণ্ঠও জড়িয়ে এলো। - ভালোরে, আমরা সবাই ভালো। আবার তোদের সাথে দেখা হবে ভাবিনি। কি যুদ্ধটা গেল।
মীনু আপা আমাকে দেখে অবাক কণ্ঠে বললো - তুইতো অনেক বড় হয়ে গেছিস!
আমি বেশ একটা ভাব নিয়ে বললাম - সব সময় কি আর ছোট থাকবো।
মীনু আপা আমার পিঠে একটা কিল বসিয়ে দিলো। - ইসরে, কি আমার বড় হয়েছে। এই পিচ্চিটা কে? এটাকে তোরা কোথায় পেলি? মিল্কী এই কথা শুনে হেসে কুটিপাটি হলো। শীঘ্রই মীনু আপা আমাকে বিস্মৃত হয়ে মিল্কীকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। আমি কিঞ্চিৎ ঈর্ষা অনুভব করলাম। মনে হচ্ছে পূর্বে আমি যে ধরনের ভালোবাসা ও আগ্রহ পেতাম সবার কাছ থেকে, এখন সেটা মিল্কীর ভাগ্যে বরাদ্দ হয়ে গেছে। বড় হবার সমস্যাও কিছু কম নয়। তবে বাবা যখন

বললেন - দেখিস খোকা, জিনিস যেন সব রিক্সায় ওঠে, তখন অন্য রকম একটা ভালোলাগা অনুভব করলাম। আমি আর শিশু নই এবং অল্প-বিস্তর নির্ভরযোগ্য, এটাও যথেষ্ট পরিতৃপ্তির বিষয়।

চাচুর বাড়ি পৌঁছে দেখলাম সেখানেও হুলস্থুল কান্ড। পাড়া-প্রতিবেশী সবাই উপচে পড়েছে। সবাই জানতো আমরা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানে আটকা পড়েছিলাম। যুদ্ধ পরবর্তিকাল প্রায় দুই বছর বন্দী অবস্থায় থেকেছি। সবারই সহজাত আগ্রহ ছিলো আমাদের সাথে আলাপ করার। তাদের প্রশ্নের যেন কোন শেষ নেই। কোথায় ছিলাম, কিভাবে ছিলাম? কি খেতাম? ওরা কেমন মানুষ? জেলের মধ্যে ছিলাম কিনা? পরিশেষে যখন সবাই বিদায় নিলো বাবা-মা মহা পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন। তাদের ইচ্ছা পরদিনই দাদু বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়া। জিনিষপত্র সব সাথে করে নিয়ে যাবার কোন অর্থ হয় না। কিছু গোছগাছ করবার সময় প্রয়োজন। অনেক রাত পর্যন্ত খাওয়া-দাওয়া, গল্প চললো। ঠিক হলো পরদিন দুপুরের দিকে রওনা দেবো আমরা। মীনু আপাও আমাদের সাথে যাবে। সাতক্ষীরা থেকে কালিগঞ্জ মাত্র বিশ মাইলের মতো পথ। বাবা স্কুটারে যাওয়াই সাব্যস্ত করলেন। আনন্দে আর উত্তেজনায় আমার রাতে যেন ঠিক মত ঘুমও হলো না।

পরদিন সকাল থেকেই টাপুর টুপুর বৃষ্টি শুরু হলো। বাংলাদেশ বৃষ্টির দেশ। এসব নিয়ে মাথা ঘামালে বাইরে যাতায়াত করা বন্ধ করতে হবে। কাউকেই এটা নিয়ে উদ্বিগ্ন মনে হলো না। তবে বৃষ্টি যে একটা উপদ্রব তাতে কোন সন্দেহ নেই। একটা স্কুটারের মধ্যে আমরা ছয়জন মানুষ বসবো, বৃষ্টির ছিটা খেতে খেতে যেতে হবে এতোখানি পথ। কি আর করা? দুপুর নাগাদ বৃষ্টির দাপট সামান্য বাড়লো। রাস্তা-ঘাট ইতিমধ্যেই ছপছপে হয়ে উঠেছে। চাচী আমাদেরকে না খাইয়ে ছাড়বেন না। ফলে নাকে মুখে চাট্টিখানি খেয়ে আমরা স্কুটারে উঠলাম। চাচু ছাতা নিয়ে ষ্ট্যান্ডে গিয়ে একটি স্কুটার একেবারে দ্বারপ্রান্তে নিয়ে এসেছেন। মা, মীনু আপা, রুশী আর মিল্কী বসলো পেছনে, আমি আর বাবা সামনে স্কুটার চালকের দুই পাশে। একটু চাপাচাপি হলেও স্কুটার চালক কোন আপত্তি করলো না। এটা তার জন্য স্বাভাবিকই মনে হলো। মিল্কী মায়ের কোলের মধ্যে বসে বড় বড় চোখ মেলে চারদিক দেখছে আর খুব পট্ পট্ করছে। কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি? দাদুর দাড়ি আছে কিনা? গরু আছে কিনা? গরুর পিঠে চড়া যায় কিনা? তার প্রশ্নের বহর দেখে আমাদের হাসি থামানো দায় হয়ে উঠছে। এখন বৃষ্টি নেই, তবে ভেজা রাস্তা হওয়ায় গাড়িগুলো একটু সতর্কভাবে চলছে। আমাদের স্কুটার অবশ্য বীর বিক্রমে সবাইকে কাটিয়ে যাচ্ছে। চিকণ রাস্তা। ফলে কাউকে অতিক্রম করতে হলে অন্যমুখী লেনে চলে যেতে হয়। প্রায়ই অন্যান্য গাড়ির মুখোমুখি পড়তে হচ্ছে। তারা সামান্য গতি কমানোর ফলে আমাদের স্কুটার নিরাপদে আবার নিজের লেনে ফিরে যেতে পারছে। কেউ বিশেষ বিরক্ত হচ্ছে

বলে মনে হলো না। এদিককার রাস্তা ঘাটে হয়তো এসব স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা দীর্ঘদিন বাইরে থাকায় ব্যাপারটা কেউই সহজভাবে নিতে পারছি না। মা একটু পর পরই বলছেন - একটু সাবধানে চালাও বাবা। এতো তাড়াহুড়ার তো কিছু নেই।

একটা বাস আসছে বিপরীত দিক থেকে। রাস্তার প্রায় মাঝ বরাবর আসছে। অপ্রশস্ত রাস্তায় এটা স্বাভাবিক নয়। আমাদের স্কুটার চালক অবশ্য সেটা তেমন গায়ে মাখলো না। সে মায়ের কথার জবাবে মুচকি একটু হাসি দিয়ে একেবারে রাস্তার অন্য পাশ ঘেষে এগিয়ে চললো। ব্যাপারটা ঘটলো মুহুর্তের মধ্যে, অবাস্তব একটা স্বপ্নের মতো। আমাদের স্কুটারটাকে পাশ দিয়ে ধাক্কা দিলো বাসটা। স্কুটারের হালকা শরীরটা একটা ডিগবাজি খেয়ে রাস্তার পাশে ফসলের ক্ষেতের পাশে গিয়ে কাত হয়ে পড়লো। আমি নড়বার চেষ্টা করতে গিয়ে অসক্ষম হলাম। পাটা কোথায় আটকিয়ে গেছে। বাবাকে দেখলাম হ্যাচকা টান দিয়ে নিজেকে স্কুটারের নীচ থেকে টেনে তুললেন। তার শরীরে রক্তের স্পষ্ট চিহ্ন, কোথায় কেটেছে বোঝা যাচ্ছে না। ড্রাইভারের মাথায় প্রচুর রক্ত। তাকে বেশ নিস্তেজ দেখাচ্ছে। তার ক্ষত মারাত্মক হতে পারে। পেছনে তাকিয়ে দেখলাম মায়ের কপালের বিভিন্ন স্থানে ফেটে গেছে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে। দুর্ঘটনার ঠিক আগে মা বোধহয় টের পেয়েছিলেন। তিনি মিল্কীকে কোলের মধ্যে সম্পূর্ণ ঢেকে ফেলেছিলেন নিজের শরীর দিয়ে। মিল্কীর কিছুই হয়নি। সে প্রচন্ড ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে উৎকট শব্দে কাঁদছে। সৌভাগ্যবশতঃ মীনু আপার কিছুই হয়নি। সে মায়ের কোল থেকে মিল্কীকে নিয়ে বাইয়ে গিয়ে দাঁড়ালো। রুশীর কপালে রক্ত দেখলাম। নিশ্চয় তার কপাল কেটেছে। সে একটা অদ্ভুত কাজ করলো। লাফ দিয়ে স্কুটার থেকে বাইরে গিয়ে চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে ফসলের ক্ষেতের মধ্যে দৌড় দিলো। বাবা পেছন থেকে চিৎকার করে ডাকলেন কিন্তু সে শুনলো না। ক্ষেতে বেশ কিছু চাষী কাজ করছিলো, দুর্ঘটনাটা দেখার সাথে সাথে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে এলো তারা। রুশীকে তারাই কোলে করে নিয়ে এলো। কিন্তু রুশী যে হারে হাত পা ছুড়ছে তাতে যে বেচারি চাষীটি ওকে কোলে নিয়েছিলো, তার হাঁসফাঁস অবস্থা। এদিকে আমাদেরকে ধাক্কা দিয়ে সাতক্ষীরামুখী বাসটি না থেমেই চলে যাচ্ছিলো। কিন্তু একটু পরে দেখলাম সেটা খানিকটা দূরে গিয়ে থেমেছে। বাসের যাত্রীরা বেশ কয়েকজন ছুটে এলো। পরে জেনেছি বাসের যাত্রীরাই ড্রাইভারকে ধমক দিয়ে বাস থামায়। তাদের জন্যেই সম্ভবত আমরা দ্রুত চিকিৎসা পাবার সুযোগ পেলাম। কয়েকজন স্কুটারটাকে ধরে সোজা করলো। আমি তখনও ভেতরেই আটকা পড়ে আছি। কোন ব্যথা অনুভব করছি না কিন্তু বাম পাটা বেরও করতে পারছি না। দেখা গেলো গিয়ারের নীচে আটকে গেছে। দুই তিনজন মিলে প্রচন্ড টানাটানি করার পর গিয়ারটা একটু ঢিলা হলো। বাবা এবং অন্য একজন বাসযাত্রী আমাকে টেনে স্কুটারের বাইরে নিয়ে এলেন। আমি দাঁড়াতে গিয়ে মাটিতে বসে পড়লাম। বাম পায়ে বিন্দুমাত্র জোর নেই। বাবা আমাকে কোলে তুলে নিলেন। কয়েকজন যাত্রী গিয়ে বাস ড্রাইভারকে বাধ্য করলো ব্যাক করে আমাদের পাশে

আনতে। আমরা সবাই উঠলাম বাসে। চারদিকে মুহূর্তে রক্তে ভরে গেলো। মায়ের চেহারা দেখে আমার বুকটা কেঁপে উঠলো। আমার নিজের কি হয়েছে এখনো পরিষ্কার নয় কিন্তু কোন ব্যথা না থাকায় অস্বস্তি বোধ করছি না। বাস আমাদেরকে নিয়ে সরাসরি সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালে গেলো। প্রাথমিক চিকিৎসার পর জানা গেলো আমাদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ। মায়ের কপালে দুই জায়গায় ফেটে গেছে – সৌভাগ্যবশত কোনটাই তেমন গভীর নয়, মোট সাতটা-আটটা স্টিচ দিতে হলো। রুশীর কপালে তিন-চারটা স্টিচ লাগলো। বাবার উরুতে বেশ গভীরভাবে কেটে গিয়েছিলো, সামান্যর জন্য বড় শিরা কাটেনি। আমার বাম পায়ের উরুর হাঁড়টা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে গেছে। ঐদিন রাতেই পায়ে বিশাল সাদা ধবধবে ব্যান্ডেজ নিয়ে চাচুর বাসায় ফিরে এলাম আমি। আমার জন্য আলাদা বিছানার ব্যবস্থা করা হলো। একটা স্লিং ঝুলিয়ে সেটার সাথে পাটা বেঁধে উঠিয়ে দেয়া হলো। এমন অস্বস্তিকর অবস্থায় আমার সমগ্র জীবনে কখনো পড়িনি। সবচেয়ে বেদনাদায়ক লাগছে যখন বিভিন্ন জায়গায় চুলকাতে শুরু করছে। কখনো কখনো মনে হচ্ছে একটু চুলকাতে না পারলে পাগল হয়ে যাবো। ব্যান্ডেজের উপর দিয়েই চুলকানোর অভিনয় করছি। তাতে নাকি মানসিকভাবে কাজ হয়। বাংলাদেশে ফিরেই এই আপদে পড়বো কে ভেবেছিলো? আমার চোখের জল নাকের জল এক হতে লাগলো। তবে খুব শীঘ্রই এর কিছু ভালো দিকও নজরে এলো। কয়েকদিনের মধ্যেই আমি বেশ একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিতে পরিণত হলাম। বাসার সকলেই পালা করে আমার সাথে গল্প করে, আমাকে খাওয়ায়, আমাকে সঙ্গ দেয়। দূর-দূরান্ত থেকে আমাদের পরিচিত মানুষেরা, বিশেষ করে আত্মীয়-স্বজনেরা সবাই আসতে লাগলেন আমাদেরকে দেখার জন্য। বাবা-মা ও রুশীর ক্ষত কয়েকদিনেই অনেকখানি ভালো হয়ে উঠেছিলো। আমার পা না ভাঙলে আমরা হয়তো দেশের বাড়িতে যেতে পারতাম। কিন্তু আমাকে ছেড়ে তারা যেতে চাইলেন না। ফলে সবাই আমাদেরকেই দেখতে এলেন। দাদু-দাদী ও ঝিমাও এলেন। ঝিমা আমার ঝুলন্ত পা দেখেই ডুকরে কেঁদে উঠলেন। - ওরে তোরা আমার খোকার একি হাল করেছিস? তিনি যে কটা দিন থাকলেন আমার পাশ ছেড়ে নড়লেন না। তারা অবশ্য খুব বেশীদিন থাকতে পারলেন না। বাড়িতে মজুরেরা কাজকর্ম করছে। সেখানে তাদের উপস্থিতি খুবই জরুরী। ভেবেছিলাম তারা চলে যাবার পর রানী আপারা হয়তো আসবে। কিন্তু খবর এলো মামা কাজে ভয়ানক ব্যস্ত। স্কুলে পরীক্ষার প্রস্তুতি চলছে। আসবার ইচ্ছা আছে কিন্তু ঠিক সময় করতে পারছেন না। নানারও আসার ইচ্ছা আছে কিন্তু ক্ষেতে কাজ হচ্ছে। তার জন্যেও আসাটা দুষ্কর হয়ে উঠেছে। তবে দু'জনের যিনিই আসুন রানী আপা তার সাথে অবশ্যই আসবে। আমি দিন গুনতে থাকি। ইতিমধ্যেই আমাদের ঢাকা ফিরে যাবার কথা উঠছে। এখানে আমার চিকিৎসা ঠিক মতো হবার সম্ভাবনা কম। চলে যাবার আগে রানী আপার সাথে একবারও দেখা হবে না ভাবতেই খারাপ লাগছে।

প্রায় তিন সপ্তাহ পর আমাকে আবার চেক আপের জন্য হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া হলো। এক্সরে করে দেখা গেলো হাড়ের অবস্থান ঠিক হয়নি। মুখোমুখো না হয়ে পাশাপাশি জোড়া লেগে যাবার সম্ভাবনা। যার অর্থ আমাকে হয়ত খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হবে। ঠিক হলো আমার পাষ্টার খুলে আবার হাড়টাকে ঠিকমতো বসানোর চেষ্টা করা হবে। পরদিনই স্ট্রেচারে করে আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। পাষ্টার খোলার পর যা করা হলো তা ভাষায় বর্ণনা করা চলে না। প্রায় পাঁচ ছয় জন আমাকে সজোরে জাপটে ধরে আমার ভাঙা পাটাকে দুইদিক দিয়ে প্রচন্ড জোরে টানতে লাগলেন। আমি প্রচন্ড যন্ত্রণায় দিক বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে হাত পা ছুড়ছি এবং চিৎকার করছি। বাবা আমাকে শক্ত করে ধরে শুধু বললেন - আর একটু বাবা, আর একটু। এই প্রহসন চললো কম করে হলেও মিনিট পাঁচেক। মনে হলো অবশ্য অনন্তকাল। শেষ পর্যন্ত যখন এই যন্ত্রণার অবসান হলো আমার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। আবার নতুন করে পাষ্টার করা হলো। এতো টানা হ্যাচড়ায় কোন লাভ হলো বলে মনে হলো না। সেই রাতেই বাসায় ফিরে বাবা ঢাকা ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। আর বড় জোর চার-পাঁচ দিন। আমার ব্যান্ডেজটা একটু বসে গেলেই আমরা রওনা দেবো।

আমাদের রওনা দেবার ঠিক আগের দিন নানা, মামা ও রানী আপা সাতক্ষীরা এলেন। আমার অবস্থা দেখে রানী আপার মনটা খারাপ হয়ে গেলো। আমরা দু'জনে যখনই একসঙ্গে হয়েছি তখনই শুধু ছুটাছুটি করেছি। এইরকম অদ্ভুত পরিস্থিতিতে কখনো পড়তে হবে কে ভেবেছিলো। রানী আপাকে দেখলাম আগের চেয়ে একটু গম্ভীর হয়েছে। বুঝলাম সে এবার বড় হচ্ছে। আগের মতো আচরণ করাটা এখন হয়তো আর শোভা পায় না। আসবার সময় মনে করে জব্বল মামার দোকান থেকে আমার জন্য তেঁতুলের বিচির বিস্কুট এনেছিলো। সেগুলো দু'জনে মিলে গল্প করতে করতে খুব সেঁটে খেলাম। মিন্কী অবশ্য একটু পর পরই এসে বিস্কুটের উপর হামলা চালাতে লাগলো। তার খাবার ততো আগ্রহ নেই। সে চাচীর হাঁস মুরগীদেরকে খাওয়াতেই বেশী আগ্রহী।

রানী আপার কাছেই শুনলাম যুদ্ধের পর গ্রামের পরিবেশ আগের চেয়েও খারাপ হয়েছে। মামা খুলনাতে বাস গাড়ার চিন্তাটা বেশ জোরেসোরেই করছেন। সেখানে স্কুলে কাজ খুঁজছেন, যদি পেয়ে যান তাহলে হয়তো চলেই যাবেন। দেশের জমিজমা দেখার জন্য মানুষ রাখতে হবে। নিজেরাও দরকার মতো এসে দেখে যাবেন। দূরত্ব বেশী নয়। একদিক দিয়ে ভালোই হবে। আমরা খুলনা এলে একইসাথে সবার সঙ্গে দেখা হবে।
ঢাকা ফেরার জন্য মাইক্রোবাস ভাড়া করেছিলেন বাবা। আমার পাষ্টার বাঁধা পা নিয়ে বাসে যাওয়াটা সম্ভব হতো না। পরদিন সকাল সকাল রওনা দিলাম। মা নানুর বুকে মাথা রেখে খুব কাঁদলেন। কারণটা ঠিক বোঝা গেলো না। তবে মা মাঝে মাঝে অকারণে খুবই আবেগপ্রবণ হয়ে

পড়েন। তার কান্নাকাটির কোন স্পষ্ট কারণ থাকাটার প্রয়োজন হয় না। রানী আপা আমার হাত মুঠি করে ধরে বললো - ভালো হয়ে যাবি তুই। আমরা আবার আম কুড়াবো। ভালো হয়ে গেলে চলে আসবি। ঠিক তো?

আমি মাথা নাড়ি। আসবো। চোখের কোণটা অকারণে জলে ভিজে ওঠে। এতোখানি পথ ঠেঙিয়ে এসে এই হুজ্জতে পড়ে গ্রামে যাওয়া হলো না আমার। সেই মায়াময় মাঠ-ঘাট আর বিলের হাতছানি অনুভব করি হৃদয়ের গভীরে। ঢাকা ফিরে গেলে বাবার কাজ শুরু হবে, আমাদের স্কুলে যেতে হবে। আবার কবে আসার সুযোগ হবে কে জানে?

চাচু আর মীনু আপার সঙ্গী হয়ে রানী আপাও আমাদের মাইক্রোবাসের পেছন পেছন হেঁটে বেশ খানিকদুর এলো। যতক্ষণ তাদেরকে দেখা যায় আমি তাকিয়ে থাকলাম। গলার ভেতরে এমন ভারী হয়ে উঠলো যে ঢোক গিলতেও কষ্ট হচ্ছে। আমিও বোধহয় মায়ের মতই অনুভূতিপ্রবণ হয়েছি।

সুজা রশীদ, টরেন্টো, কানাডা

বিঃ দ্রঃ

জনাব শুজা রশীদ প্রবাসে বসে স্বদেশে নিজের হারানো দিনগুলোকে নিয়ে 'দামামা' নামে একটি বই লিখেছেন। আসছে মে - ২০০৬ তিনি তা বই আকারে ছাপতে যাচ্ছেন। তার আগে আমাদের কর্ণফুলী'তে তাঁর এ অপ্রকাশিত বইটি ধারাবাহিকভাবে আমাদের অগনিত পাঠকদের জন্যে তিনি পরিবেশন করছেন। প্রবাসী ব্যস্ততায় লেখা তাঁর এ প্রকাশিতব্য বইটি পড়ে কেমন লাগছে পাঠকরা আমাদের ইমেইল করে জানালে আমরা তাঁকে সাথে সাথে পাঠকদের মতামত জানিয়ে দেব।